Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501009

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The Unfamiliar Kolkata and the Light and Shadow of History — Mitin Mashi on the Trail
অচেনা কলকাতা ও ইতিহাসের আলো অন্ধকার — সন্ধানে মিতিন মাসি

Dr. Pritam Chakraborty
Assistant Professor
Bengali Department
Seth Surajmal Jalan Girls College
Kolkata

Received on: 20th February 2026
Accepted on: 28th February 2026

Abstract:
In the 21st-century in the pages of Anandamela, Suchitra Bhattacharya's Mitin Mashi — accompanied by her niece, Tupur — sent the excitement levels of young readers soaring high level. From supervising her son Bumbum's homework to trading witty banter with her foodie husband, Partha, Pragnaparamita's formidable intellect operated in perfect parallel. These stories offered more than mere mystery-solving; emerging from the chiaroscuro of the metropolis, they unveiled an unfamiliar Kolkata — a vivid tableau of a civilization in gradual decline. It appears that, in crafting these narratives, the author sought to accord particular significance to this very theme. Through her storytelling, Suchitra endeavored to present her adolescent readership with a holistic portrait of the magnificent city of Kolkata. In her mystery tales set beyond the city limits, she infused a refreshing change of pace and a rich tapestry of variety. Yet, as the consummate chronicler of Kolkata's middle-class life, she seemed to rediscover and reimagine the city itself through the adventures of Mitin Mashi. Perhaps, she sought to impart a lesson to young minds—encouraging them to bow in reverence before the positive traditions of all religions, castes, and linguistic communities. In this context, the following Mitin Mashi stories are examined in the article: Jonathaner Barir Bhut (The Ghost of Jonathan's House), Jhao Jien Hatya Rahasya (The Jhao Jien Murder Mystery), Ayarakiler Hire (The Diamond of Ayarakil), Hate Matro Tinte Din (Only Three Days Left), Marquis Streete Mrityufand (Death Trap on Marquis Street), and Dushwapna Bar Bar (Recurring Nightmare).

Key Words:
Kolkata, Mitin Mashi, Jonathaner Barir Bhut, Marquis Streete Mrityufand, Kolkata's middle-class life.

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

'বেস্ট বেঙ্গালি ফিচার ফিল্ম' হিসেবে ২০০৩ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরৎ' ছবিটি এবং 'বেস্ট সাপোর্টিং এক্ট্রেস' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন রাখী গুলজার, সিনেমায় রাঙাপিসিমা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। চার দেওয়ালের মাঝে কিছু বিড়ালছানা নিয়ে আর সাংবাদিক ভাইজি মল্লিকার (অভিনয়ে নন্দিতা দাশ) সামান্য সহায়তায় তিনি শুরু করেছিলেন গোয়েন্দাগিরি। মূলত আগাথা ক্রিস্টির 'দ্য মিরর ক্র্যাকড' কাহিনির অনুপ্রেরণায় ছবিটি তৈরি করেছিলেন পরিচালক। মিসেস মার্পেলের আদলে তৈরি রাঙাপিসিমার হাতে অবশ্য উলের কাঁটার বদলে ঋতুপর্ণ তুলে দিয়েছিলেন পানের বাটা। পরে তিনি রাঙা পিসিমাকে নিয়ে টেলিভিশনের জন্য তেরোটি সিরিজ বানাবেন ঠিক করেছিলেন (সেখানে রাঙা পিসিমা ও মল্লিকার ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে অলকনন্দা রায় ও দামিনী বসু)। কিন্তু একটি সিরিজ ('তাহার নামটি রঞ্জনা') তৈরির পরেই প্রয়াত হলেন পরিচালক। তবে এসবের অনেক আগেই ভারতী-গোষ্ঠীর লেখক (এবং রবীন্দ্রসংগীত-সাধিকা সুচিত্রা মিত্রের 'পিতৃদেব') সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬৬) কলমে পেয়েছি বিন্দি পিসিকে, যিনি কাঁথা বুনতে বুনতে গোয়েন্দাগিরি চালিয়েছেন। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর (১৯০৫-১৯৭২) গোয়েন্দা কৃষ্ণা একসময় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, পরে তিনি অগ্নিশিখা রায় ওরফে শিখা নামেও গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দৌহিত্রী তথা জীবনানন্দ দাশের ভ্রাতৃবধূ বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা নলিনী দাশ (১৯১৬-১৯৯৩) সন্দেশ-এর সূত্রেই বোর্ডিং স্কুলের চার ছাত্রী — কালু মালু টুলু বুলুকে নিয়ে লিখেছিলেন গোয়েন্দা গণ্ডালু সিরিজ। সাতের দশকে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল মনোজ সেনের 'রহস্য সন্ধানী' দময়ন্তী সেন। অদ্রীশ বর্ধন ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলা-গোয়েন্দা যথাক্রমে নারায়ণী ও গার্গী। হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত-এর গোয়েন্দা ক্যাটরিনা ওরফে কিটি, যার সহযোগী টিনা (সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পেশাদারী গোয়েন্দা 'দীপকাকু'র সহযোগী হিসেবে এসেছে ক্যারাটে-জানা ভাইঝি 'ঝিনুক')। এই ধারাতেই বলিষ্ঠ সংযোজন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসি, আবির্ভাব একুশ শতকের সূচনায় 'আনন্দমেলা'র হাত ধরে।

মিতিনের গোয়েন্দা এজেন্সির নাম 'থার্ড আই', ব্যোমকেশের 'সত্যান্বেষী' বা ফেলুদার 'মগজাস্ত্রে'র মতোই ওই শব্দবন্ধটি মিতিনের সঙ্গে মিশে আছে। মিতিনের পোশাকী নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়, বাস কলকাতার ঢাকুরিয়া; অর্থাৎ স্রষ্টার বাড়ির সন্নিকটে! শব্দজব্দ আর নিউজ-পেপারে ডুবে থাকা পেটুক স্বামী পার্থর আছে প্রেস ('হাইলি ইন্টারেস্টিং'টা সে বোধহয় লালমোহন বাবুর ভঙ্গিতেই বলে)। তবে শার্লক হোমসের যেমন ওয়াটসন বা ব্যোমকেশ-ফেলুদার যথাক্রমে অজিত ও তোপসে, তেমনি মিতিনের আছে বোনঝি টুপুর ওরফে ঐন্দ্রিলা। তার বিভিন্ন কাহিনির টুকরো টুকরো ছবিতে ধরা পড়েছে হাতিবাগানে টুপুরের ঘরোয়া-মা সহেলী, বই আর ঘুমে ডুবে থাকা অধ্যাপক-বাবা অবনী, মিতিনের শিশুপুত্র বুমবুম এবং পুলিশের ডিআইজি অনিশ্চয় মজুমদার; ইনি আবার 'মজাদার' মানুষ — 'নিপাট গোবেচারা চেহারা, একটা জাঁদরেলি পুলিশি গোঁফ পর্যন্ত নেই। মাথাজোড়া টাক, ফোলাফোলা গাল।' বড়োদের জন্য সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিনকে নিয়ে আগেই লিখেছিলেন উপন্যাস পালাবার পথ নেই, পরে পাঁচটি নাতিদীর্ঘ কাহিনি ('একটা শুধু রং নাম্বার', 'বিষ', 'মেঘের পরে মেঘ', 'মারণ বাতাস', 'তৃষ্ণা মরে গেছে')। তখন অবশ্য 'মাসি' নয়, প্রজ্ঞাপারমিতা-মিতিন, সহযোগী হিসেবে প্রায়-কিশোরী টুপুর সেখানে অনুপস্থিত।

মিতিন মাসির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন তিনি চরিত্রটিকে 'সৃষ্টিছাড়া বীরাঙ্গনা' হিসেবে তৈরি করেন নি। বরং এই গোয়েন্দা 'শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী সাহসী অথচ ঘরোয়া গৃহবধূ'; ছেলেকে হোমটাস্কে সাহায্য করা থেকে হেঁসেল সামলানো, 'আবার ব্যাগে রিভলবার পুরে খুনে-বদমাশদের সে ধাওয়াও করে অনায়াসে। এবং রহস্য উন্মোচন তার পেশা তো বটেই, নেশাও।' এছাড়াও নিজের গোয়েন্দা-কাহিনির আরেকটি দিকের উল্লেখ করেছেন সুচিত্রা — 'কাহিনির ভেতর দিয়ে যেন দেশ-বিদেশে নানান জায়গা, ধর্ম কিংবা সমাজ সম্পর্কে পাঠকেরা অল্প অল্প কিছু জানতে পারেন। জ্ঞান দিইনি, গল্পের মোড়কেই তথ্য বিতরণ করেছি কিছু কিছু।'[১] একথা তিনি টেলিভিশনের পর্দায় একাধিক বার বলেছেন, এবং স্মরণজিৎ চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও জানিয়েছেন — 'কিশোর বয়সীদের নিয়ে লেখা লিখতে গিয়ে আমি বেশ সতর্ক থাকি। কেবলই মনে হয়, শুধু গোয়েন্দা গল্পের একটা মোড়ক থাকে ঠিকই, কিন্তু সেটা ছাপিয়ে আমি আরো কিছু বলি। বলি কোনো একটা জায়গার ইতিহাস, তার কৃষ্টি, তার বর্ণনা, মানুষজন। তবে সবটাই গল্পের ছলে। যেমন ধরো ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য। কত বছর ধরে চিনারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানিনা। তাদের লোকাচার, আচার-ব্যবহার, বিবাহ উৎসব — এসব বিষয়ে আমরা খুব একটা জানিনা। শুধু চিনারা নয়, আর্মেনিয়ানদের নিয়ে, ইহুদিদের নিয়েও আমি লিখেছি। শুধু জ্ঞান না দিয়ে গোয়েন্দা গল্পের মোড়কে আমি এসব জানাতে চাই।'[২] এ

© Santiniketan Sahityapath

ব্যাপারে সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। মনে রাখতে হবে তাঁর একেবারে প্রথম দিকের উপন্যাস আমি রাইকিশোরীতে লেখিকা নিজের কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্বের অভিজ্ঞতা সূত্রে ডোমা, ক্রিশ্চিন, মার্গারেট, শার্লির মতো চরিত্রদের এনেছিলেন। স্রষ্টা নিজে উৎসাহী ছিলেন বলেই আগ্রহ তৈরিতে সাফল্য পেলেন শুধু কিশোর-মন নয়, সব শ্রেণির পাঠকের মধ্যে।

'সারান্ডায় শয়তান' (২০০৩) দিয়ে মিতিন মাসির গোয়েন্দাগিরির শুরু, প্রেক্ষাপট জঙ্গল; পরেরটি জোনাথনের বাড়ির ভূত 'সারান্ডায় শয়তান' (২০০৩) দিয়ে মিতিন মাসির গোয়েন্দাগিরির শুরু, প্রেক্ষাপট জঙ্গল; পরেরটি জোনাথনের বাড়ির ভূত (২০০৪), কাহিনির কেন্দ্রে লেখিকা এনেছেন ইলিয়ট রোডের একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারকে। এখানে খুব অজানা ইতিহাসের প্রসঙ্গ না আনলেও পার্থ ও টুপুরের কথোপকথনে ঔপনিবেশিক ভারত আর অষ্টাদশ শতকের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এসেছে। যেমন লেবুতলা বা সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের ইতিহাস, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর্তুগিজ কেরানি ও হুজুরমিলের কেরানিবাগান, বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড থেকে পার্কস্ট্রিট, ওয়ারিং হেস্টিংস-ইলাইজা ইম্পে-নন্দকুমার — ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র, নির্মমতা ও ভাগ্যের পরিহাস। লোয়ার সার্কুলার রোড (যা বর্তমানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) তথা মারহাট্টা ডিচ ক্যানেলে ইতিহাস সন্ধানে ভাস্কররাম কোলহাতকরের উল্লেখ, যাকে 'সামলাতেই একুশ হাত চওড়া, সাত মাইল লম্বা পরিখা খোঁড়ার প্ল্যান করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এন্টালি অবধি খাল খোঁড়ার পর ভাস্করপণ্ডিত খতম হয়ে গেল মুস্তাফা খাঁ নামে এক আফগান সৈনিকের হাতে। পরে মারাঠারা আর-একবার অ্যাটাক করেছিল। তখন খালটাকে এন্টালি থেকে বেকবাগান অব্দি বাড়ানো হয়। ওই খাল বুজিয়েই সার্কুলার রোড।' লেবুতলা নেড়াগির্জার ছাদ ভেঙে পড়ার পর সার্কুলার রোডে তৈরি হয়েছিল জোড়াগির্জা, তার পাশে ছিল চিৎপুরের নবাব মহাম্মদ রেজা খাঁর উত্তরসূরি সৌলদ জং-এর বাগানবাড়ি, বর্তমানে যা নোনাপুকুর ট্রামডিপো। কলকাতার বুকে একাধিক পদ্মপুকুরের প্রসঙ্গও এসেছে।

ভূতের অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে পার্থ উল্লেখ করেছেন মহাকরণ-রাজভবন থেকে ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম গেট বা রাসেল স্ট্রিটে বিশপ-ভূতের অস্তিত্ব। তবে এখানে বাদ পড়েছে 'এঁদো গলির ভুতুড়ে গার্সটিন বিল্ডিং'। তবে অফিস পাড়ার ফুটপাতে যেমন সিরাজের হাতে ধ্বংস হওয়া ব্রিটিশদের প্রথম কেল্লার চিহ্নের কথা বলেছে মিতিন, বিবাদীবাগের মিনিবাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে তারা পৌঁছে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার কাছে — 'জোব চার্নকের কবরের ওপর একটি সমাধিসৌধ আছে। তৈরি করে দিয়েছিল জোব চার্নকের বড়ো জামাই চার্লস আয়ার। জোব চার্নকের তিন মেয়ে ছিল। মেরি, এলিজাবেথ আর ক্যাথরিন। তিন মেয়েই মারা গিয়েছিল কলকাতায়। তার মধ্যে বড় ও ছোটকে কবর দেওয়া হয়েছিল বাবার পাশে।' শুধু তাই নয় অন্ধকূপ হত্যার সূত্রে হলওয়েল মনুমেন্টের কথাও আছে, যদিও এটিকে 'অপবাদ' বলে মনে করেছে মিতিন — 'সুভাষ বোসের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশরা মনুমেন্টটা সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখনও ওই মনুমেন্টের গায়ে সাহেবদের লেখা মিথ্যেগুলো জ্বলজ্বল করছে।'

মূল কাহিনির কেন্দ্রে আছেন জোনাথন মাইকেল, যিনি ফার্স্ট জেনারেশন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বাবা সুরেন ভাদুড়ি আইরিস কন্যা মার্গারেটকে বিয়ে করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন, মাতৃসূত্রেই পেয়েছিলেন সম্পত্তি। মার্গারেটের দিদিমার বাবা রবার্ট ম্যাকগ্রেগরের সূত্রে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে গোয়েন্দা কাহিনিতে। তাঁতিয়া টোপীর ঘনিষ্ঠ কানোয়ার সিংকে ম্যাকগ্রেগর অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। ১৮৬১ সালে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর ম্যাকগ্রেগরের তৈরি করা বাড়িতেই রহস্যময় কাণ্ডকারখানার কেন্দ্র। সমাধান সূত্র অবশ্য ম্যাকগ্রেগরের কবরের ফলক, লোয়ার সার্কুলার রোডের যে কবরখানায় আছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিও।

কাহিনি-সূত্রে টুপুরকে নিয়ে মিতিন পাড়ি দিয়েছিল ভাগলপুর। তবে জোনাথনের আত্মীয়া অধ্যাপক শর্মিলা মিত্রের কথায় বোঝা যায় সেখানকার বাঙালিরা ভাগলপুরকে বিহার বলে মনে করে না, গর্বের সঙ্গে বলেন — 'বিড়াল যেমন বাঘের মাসি, ভাগলপুর তেমনি সংস্কৃতিতে বাংলার মামা।' শরৎচন্দ্র থেকে অশোককুমার-কিশোরকুমার বা অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জীর মামারবাড়ি ভাগলপুর (মজার ব্যাপার স্বয়ং সুচিত্রা ভট্টাচার্যও জন্মেছিলেন মামারবাড়ি ভাগলপুরে)। ওই অঞ্চলের সঙ্গে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণ-বনফুল প্রমুখের প্রসঙ্গও চলে আসে। আর শর্মিলার কথায় ফুটে উঠেছে বর্তমানের চালচিত্র — '... সেই মামারবাড়ির দেশ থেকে বাঙালিরা এখন ঘটিবাটি বেচে পালাচ্ছে। লাস্ট তিরিশ-চল্লিশ বছরে কত বাঙালি যে ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। জানেন, এখন ইউনিভার্সিটিতে এমএ ক্লাসে বাংলার স্টুডেন্ট পাওয়া যায় না।'

© Santiniketan Sahityapath

'ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য' (২০০৭) মিতিন মাসির জনপ্রিয় কাহিনি, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃত অংশ থেকেই জানা যায় কাহিনির পটভূমিতে আছে কলকাতার চিনারা। অবশ্য উপন্যাসের শুরুতে টুপুর ও তার মা-বাবার কথোপকথনের সূত্রে অজন্তা-ইলোরা থেকে ভীমবেটকা গুহা কিংবা কাশ্মীরের অমরনাথ গুহা আবিষ্কারের প্রসঙ্গও এসেছে। তবে কাহিনির মূল-পটভূমি মধ্য কলকাতার ছাতাওয়ালা গলি, যে জায়গাটি চিনে-পাড়া হিসেবেই পরিচিত। এখনো সেখানকার চিনা-রেস্তোরাঁয় হাজির হন বহু খাদ্যরসিক।মূলত এক শিক্ষক ঝাও ঝিয়েন (নাম ঝিয়েন, পদবী ঝাও — চিনাদের পদবী বসে নামের আগে), তার হত্যার কিনারা করতে সেখানে যাতায়াত আগে টুপুর, পরে মিতিনের। ঝিয়েন পড়াতেন টেরিটি বাজারে চাইনিজ স্কুলে, যদিও মানুষটির উৎসাহ ছিল চিনের অতীত ইতিহাস উদ্ধার। ইউরোপ-নির্মিত বিশ্ব-ইতিহাসে তিনি আস্থা রাখেন নি। আর সেই আগ্রহই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল অকাল মৃত্যুর দিকে। মৃত্যু রহস্য উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে চিনা ইতিহাস উদ্ধার করেছে মিতিন, তাকে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ করেছেন স্বামী পার্থ ও জামাইবাবু অবনী। ঝাও পরিবারে গিয়েও জানতে পেরেছে চিনাদের নানা সংস্কার। অবনী চিনাদের 'পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। চা ও কাগজের আবিষ্কারক তাঁরাই। নৌযাত্রাতেও ইউরোপীয়দের চেয়ে এগিয়েছিল চিনারা। নৌকার আয়তন ছিল ১০০ ফুটের চেয়েও বড়ো। চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবলাই খাঁর চিন দখলের পর তাদের হটিয়ে মিংদের যে রাজত্ব, তা ছিল 'চীনের স্বর্ণযুগ', সেসময় তৈরি হয়েছিল চিনের প্রাচীর। প্রসঙ্গত এসেছে চিনা অভিযাত্রী মা-সান-পাও বা অ্যাডমিরাল জেং-এর কথা, যার জন্ম ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে। যিনি চিনের প্রতিনিধি হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করেছিলেন; কলম্বাসের আগে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়সে বাষট্টিটি জাহাজ আর প্রায় ২৭৮০০ 'অনুচর' নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এছাড়াও সপ্তম শতকে ছিলেন ফু শাং-এর মতো 'প্রবাদপুরুষ' সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন, যিনি মানচিত্রও এঁকেছিলেন। যে মানচিত্র দেখে জেং-এর সঙ্গী মো-ই-টং পৃথিবীর নতুন মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। আর যা উদ্ধার করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালেন ঝাও ঝিয়েন, যিনি ডিগ্রির জন্য নয়, পড়াশোনা করছিলেন চিনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য।

অবনীর বক্তব্য অনুযায়ী কলকাতা শহরে চিনাদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। তবে বেশিরভাগ চাইনিজ ক্যান্টনের হলেও, সাংহাই, হাক্কা, হুপো — সব জায়গায় উত্তরপুরুষই আছে এখানে। এবং এ দেশে এসেও নিজেদের ব্যবসা বজায় রেখেছে তারা — 'যেমন ক্যান্টনিরা কাঠের কাজ করেন, কিংবা হোটেল রেস্টুরেন্ট চালান। আর যত চিনা ডেন্টিস্ট আছেন তাঁরা সবাই এসেছিলেন হুপো থেকে। আর হাক্কা মানে চিনে যাঁদের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তাঁরা করেন চামড়ার ব্যবসা।' ঝাও পরিবার সাংহাইয়ের, বংশানুক্রমিকভাবে যুক্ত লন্ড্রি ব্যবসার সঙ্গে।

ছাতাওয়ালা গলির বেশিরভাগ চিনা অবশ্য চলে গেছে ট্যাংরায় এবং সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভালো নয়। চাইনিজ-স্কুল তো উঠেই যাচ্ছে। রুটি রুজির জন্য সবাই নিজেদের বাচ্চাদের ঠেলে দিচ্ছে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে। বলাবাহুল্য ঝাও ঝিয়েন ছাড়া সেই চিনা-স্কুলের শিক্ষকদের প্রথাগত ডিগ্রিও সেভাবে ছিল না। তবে কলকাতায় দুটি চিনাভাষার পত্রিকা প্রকাশের কথা আছে। আর স্বপন দত্তের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানচিত্র প্রসঙ্গে এসেছে আৎসু ও অছিপুরের (বজবজের কাছে) ইতিহাস। ক্যান্টনী আৎসু চায়ের ব্যবসা করতে এসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আটকে বজবজে চিনিকল খুলেছিলেন। সহায় হয়েছিলেন ওয়ানের হেস্টিং। আৎসুর নাম থেকে আৎসুপুর বা বর্তমান অছিপুরের জন্ম। সেখানে তৈরি হয়েছিল চিনা কলোনি। সে ব্যবসা বেশিদিন চলেনি, মারা গিয়েছিলেন আৎসু। ওই অঞ্চলে বড়ো বটতলার পাশে এখনো আছে চিনাম্যানতলা, আৎসুর সমাধি; চিনামন্দিরের ভেতরে আছে দেব-দেবী খুদা ও খুদি। চাইনিজ মাত্রই খ্রিস্টান বা বুদ্ধিস্ট নয়, মিতিনের কথায় — 'এদের ইতিহাস সাত হাজার বছরের পুরোনো। বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে। আর যিশুখ্রীষ্ট তো সেদিনের লোক, এই তো সবে দু'হাজার পেরোলেন। এদের আগেও তো চিনে দেবদেবী ছিল, পুজো আচ্চার চল ছিল।'

সংস্কার আছে কলকাতার চিনাদের মধ্যেও, তাদের চাইনিজ ক্যালেন্ডারে 'বছর ঘোরে চাঁদের হিসেবে। অমাবস্যা টু অমাবস্যা একমাস। ফেব্রুআরি মাসের অমাবস্যার দিন ওদের নববর্ষ। আর সেই হিসেবে অষ্টম চান্দ্রমাসের ফিফটিনথ্ ডে'তে হয় ওদের মুন ফেস্টিভ্যাল।' অনেকটা বাঙালির 'নবান্নে'র মতো। সেদিন তৈরি হয় 'মুনকেক'। এককালে ওই মুনকেকের ভেতর দিয়েই বিপ্লবের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল কুবলাই খাঁয়ের বিরুদ্ধে। কোনো নিকটাত্মীয় মারা গেলে চিনা মেয়েরা মাথায় বাঁধে নীলু উল আর ছেলেরা হাতে পরে কালো টেপ। মৃত্যুর উনপঞ্চাশ দিন পরে সেগুলি খুলে পুড়িয়ে দিতে হয়। তবে কেউ মারা গেলে চিনারা সমাধি দেয় দেরিতে,

© Santiniketan Sahityapath

কারণ 'চিনাদের ধারণা, মানুষের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না হোয়াংহো নদীর জলে নিজের ছায়া দেখে বুঝতে পারছে সে আর বেঁচে নেই, ততক্ষণ তার দেহ সমাধিতে শোওয়ানো উচিত নয়। মারা যাওয়ার পর ডেডবডি তাই দু'চার দিন বরফে রেখে দেয় ওরা।'

'আরাকিয়েলের হিরে' (২০০৯) গোয়েন্দাকাহিনির সূচনা 'জনৈক আর্মেনিয়ান মহিলা'র আগমনে। বলাবাহুল্য কলকাতার আর্মেনিয়ান সমাজের পটভূমি। তাদের নিয়ে নানা পরস্পরবিরোধী ধারণার উল্লেখ আছে। যেমন পার্থর মতানুযায়ী আর্মেনিয়ানরা 'মূলত বেনিয়া'। অন্যদিকে মিতিন জানিয়েছে বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়, 'এঁদের অধিকাংশই বয়স্ক। অনেকে চার্চ থেকে সাহায্য পান, আবার কেউ-কেউ ক্রিশ্চানদের হোম-টোমেও আছেন।' অন্যদিকে জোব চার্নক কলকাতায় আসার ষাট বছর আগে (১৬৩০) আর্মেনিয়ান মহিলা রেজা বিবির সমাধির অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তী আর্মেনিয়ান সমাধির কাল ১৭২০, অর্থাৎ মাঝে আশি-নব্বই বছরে কলকাতায় আর্মেনিয়ান অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে মিতিনের 'ধারণা'— 'নদী দিয়ে তখন হয়তো কোন আর্মেনিয়ান জাহাজ যাচ্ছিল, ওই মহিলা কোনও অসুখ-বিসুখে জাহাজে মারা যান, কাছেই ডাঙায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর যখন শহরটা গড়ে উঠল, তখনই সমাধিটা খুঁজে পেয়ে আর্মেনিয়ানরা ওখানেই একটা চার্চ প্রতিষ্ঠা করলো।' চার্চটি তৈরি হয়েছিল ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে।

পার্থর তথ্য-অনুযায়ী কলকাতার আগে আর্মেনিয়ানরা প্রথমে চুঁচুড়া, তারপর চন্দননগর হয়ে মুর্শিদাবাদ লাগোয়া সৈদাবাদে ব্যবসা শুরু করেছিল ঔরঙ্গজেবের ফরমান নিয়ে। তাদের প্রথম গির্জা ছিল চুঁচুড়ায়, সেটি বাংলার 'দ্বিতীয় প্রাচীনতম গির্জা'। শুধু তাই নয় 'সম্রাট আকবর নাকি একটি আর্মেনিয়ানকে ছেলে হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্যে প্রধান বিচারপতি নাকি ছিলেন একজন আর্মেনিয়ান। বিচারপতির নাম আব্দুল হাই।' সে সময় উত্তর-ভারত জুড়ে ঝাঁকিয়ে বসেছিল আর্মেনিয়ানরা, আগ্রায় চার্চও বানিয়েছিল।

কলকাতা শহরে আর্মেনিয়ান কমতে কমতে একশোও নেই হয়তো। অনেকেই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া বা রাশিয়া ভেঙে আর্মেনিয়া স্বাধীন হওয়ার পর সেখানে। মূল আরাকিয়েল পরিবারের ইতিহাসের কথা হারানো হিরের সূত্রে এসেছে; তার সঙ্গে গালস্টুন-পরিবারের প্রাচীন প্রতিপত্তির কথা ও ভারদোন পরিবারের উল্লেখও এখানে হয়েছে। মিতিনের তদন্ত-সূত্রে আরাকিয়েল পরিবারের দুই ভাড়াটিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান-ডিসুজা ও কেরালিয়েন-ক্রিস্টান-কুরিয়েনরাও এসেছে। কলকাতার 'আর্মেনিয়ান কলেজ এন্ড ফিলোনথ্রপিক একাডেমি'র উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইসাবেল আরাকিয়েলের কথা থেকে জানা যায় তারা পঁচিশে ডিসেম্বর বাতি জ্বালালেও ক্রিসমাস উৎসব পালন করে জানুয়ারি মাসের ছ'তারিখে।

সত্যানুসন্ধানে স্ত্রীকে সাহায্য করতে গিয়ে পার্থ 'হিরে সম্পর্কে প্রচুর ফান্ডা' নিয়ে হাজির হয়েছে; যেমন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো হিরে কালিনান, তারপর ওরলফ। পঞ্চম স্থানে কোহিনূর, দশম হর্টেন্সিয়ার। যদিও মিতিনের কাছে ওজনে নয় ঐতিহাসিক দিক থেকে কোহিনূরের মূল্য অনেক এগিয়ে। বাবর কর্তৃক মালবরাজের কাছ থেকে লুট হয়ে মুঘল সম্রাটদের হাত পেরিয়ে নাদির শাহ, রঞ্জিত সিংহের পর রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে পৌঁছেছিল। কোহিনূরের এর চেয়ে 'বেশি ইন্টারেস্টিং' ওরলফ-এর হিস্ট্রি পার্থ বর্ণনা করলেও ব্যাপারটাকে মিতিন 'গালগল্প' বলে ঝেড়ে ফেলেছে। তবে ভারত ও আর্মেনিয়ার খ্রিস্টপূর্ব-আমলের যোগাযোগ নিয়ে হ্যালির বলা কিংবদন্তি মিতিনের মতো যে-কোনো পাঠকের কাছেই 'ইন্টারেস্টিং' — '... একসময় ভারতের সঙ্গে আর্মেনিয়ার নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। শুধু তাই নয়, যিশুখ্রিস্টের জন্মের দেড়শ বছর আগে দু'জন হিন্দু রাজকুমার পাকাপাকিভাবে আর্মেনিয়া চলে গিয়েছিলেন। আর্মেনিয়ান ভাষায় তাদের একজনের নাম জেসান্নি, অন্যজনের নাম ডেমেটার। ভারতীয় ভাষায় নাম দুটো শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কৃষ্ণ আর জগন্নাথ। কনৌজের রাজা দীনাক্ষীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা। তারপর প্রাণে বাঁচতে পালিয়ে গিয়ে আর্মেনিয়ায় আশ্রয় নেন। আর্মেনিয়ার রাজা তাঁদের থাকতে দিয়েছিলেন তারোনে। পরে আরও অনেক হিন্দু সেখানে গিয়ে একটা বড়সড় শহর গড়ে তুলেছিল। তার প্রায় পাঁচশো বছর পর আর্মেনিয়ার এক খ্রিস্টান রাজার সঙ্গে হিন্দুদের যুদ্ধ হয়। হেরে গিয়ে হিন্দুরা সদলবলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।.... আর্মেনিয়ায় এখনো এক হিন্দু বীরের মূর্তি আছে। স্থানীয় ভাষায় সেই যোদ্ধার নাম আর্টজান। অর্থাৎ আপনাদের অর্জুন।'

© Santiniketan Sahityapath

'হাতে মাত্র তিনটে দিন' (২০১১) রহস্য তৈরি হয়েছিল কলকাতার একটি পারসি পরিবারের বাচ্চা অপহরণকে কেন্দ্র করে। হারানো ছাত্র রনি ওরফে রৌনকের বাবা শেঠ রুস্তমজি জরিওয়ালা কলকাতার বিশাল বড়ো ব্যবসায়ী। সেই সূত্রে পারসিদের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে পার্থ জানিয়েছে — 'ওঁদের ধনদৌলতের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই রে।... শিক্ষাদীক্ষাই বল, কী ব্যবসা-বাণিজ্য,সবেতেই ওরা ঢের এগিয়ে। গুণ আছে ওদের।' ১৮৩৯ সালে রুস্তমজি জরিওয়ালাদের ভারতে আগমন, সে বছর এজরা স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অগ্নিমন্দির। বর্তমান কলকাতায় পারসির সংখ্যা কমে সাতশো, পরিবার সংখ্যা আড়াইশো। কিন্তু এদেশে আসার পর থেকেই 'ওরা ইন্ডিয়ান হতে চেয়েছে এবং হয়েও গিয়েছে।' বড়ো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ল-ইয়ার, কবি, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সবলাইনেই ওরা সফল।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা ছিল, প্রসঙ্গত দাদাভাই নওরোজি ও মাদাম কামার নাম উল্লেখ করেছে পার্থ; এমনকি 'ইন্ডিয়ান ফিল্মের রাজা' জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডানও জাতিতে পারসি ছিলেন।

সাতশো খ্রিস্টাব্দে আরব পারস্য আক্রমণ করলে জরাথুস্টবাদী পারসিকরা পালিয়ে ইরান ও হরমুজপ্রদেশ পেরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে দিউতে চলে আসে। সেখানকার রাজা জদি রানার নির্দেশ পালন করে আচার ব্যবহার পোশাকে ভারতীয় হয়ে ওঠে, তবে টিকিয়ে রাখে নিজেদের ধর্ম। বলা বাহুল্য পারসি মেয়েদের শাড়ি পরার কৌশল বাংলায় নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের মেজোবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীর; আর তাঁরই দাদাশ্বশুর প্রিন্স দ্বারকানাথের বন্ধু ছিলেন রুস্তমজি কাওয়াস্‌জি বানাজি, যিনি কলকাতায় প্রথম 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স' (পারসিরা বলে 'দাখমা') তৈরি করেছিলেন। এটি 'পার্সিদের সিমেট্রি'। পারসি ধর্মে দাহ করা বা সমাধি দেওয়ার প্রথা নেই। ওরা একটা মিনারের চূড়ায় ডেডবডি রেখে আসে, চিল-শকুনে সেই মৃতদেহ খায়।' কারণ 'পারসিরা মনে করে অন্য কোন পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার হলে আগুন, মাটি আর জল অপবিত্র হবে।'

পারসিরা মূলত ধর্মভীরু। 'দোস্তুর'রা পুরোহিত বংশ, বিয়ে বা আচার-অনুষ্ঠানে এই পুরোহিত বা 'মোবেদ'এর বিশেষ ভূমিকা থাকে। 'শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে' পালন করে 'নওরোজ' পারস্যে সম্রাট জামশেদের সিংহাসনে বসার দিন সেটি। আগুন এদের কাছে বিশেষ পবিত্র। তাদের ধর্মগ্রন্থ আভেস্তাকে মান্য করে, যেখানে দারিদ্র্য ও ভিক্ষে দুটোই নিন্দনীয়। আসলে 'দুমদাম কিছু বদলে ফেলা' তাদের 'ধাতে নেই'। প্রাচীন রীতি মেনে অগ্নিমন্দিরে আজও শুধু পারসিরাই প্রবেশ করতে পারে। এমনকি পারসি সম্প্রদায়ের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক খুব একটা সহজভাবে গ্রহণ করেন না তারা। তবে কাউকে কোনো উপহার দেবার সময় পারসিরা প্রাপকের 'সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা' করে 'কুশল প্রার্থনা' হিসেবে লেখা — 'আফজুড ... আফজুন... আফজায়াদ... '।

কলকাতায় আছে পারসি ক্লাব, যার সূচনা ১৯০৮এ। তখন সেটি পূর্ব ভারতের পারসিদের সবচেয়ে 'খানদানি আড্ডা' ছিল। বর্তমানেও সেখানে মিলিত হন ওই সম্প্রদায়ের মানুষজন। কলকাতা থেকে পার্সিদের দুই 'হাউস জার্নাল'ও প্রকাশ পায়, 'গাবাসনি' ও 'আওয়ার ভেঞ্চার', সেই জার্নালে থাকে 'কলকাতার পারসিদের নানান সমাচার।' পারসিদের জন্য আলাদা মিশনারি স্কুলের কথাও আছে।

'মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ' (২০১৩) কাহিনির মধ্য দিয়ে লেখিকা কলকাতার ইহুদি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত করালেন পাঠককে। বলাবাহুল্য এ শহরে ইহুদিদের সংখ্যা কমছে। পুলিশ অফিসার অনিশ্চয় মজুমদারের কাছে তারা 'ডোডো পাখির মত দুর্লভ, আর সেই 'বিরল প্রজাতি'র পরিসংখ্যান মিতিনের মতে 'সাকুল্যে একশো হবে কিনা সন্দেহ'। ইহুদি পুরোহিত বংশের ডেভিড যোশুয়ার বক্তব্য অনুযায়ী প্রকৃত সংখ্যা 'উনচল্লিশ থেকে ছত্রিশে নেমে আসছে'। ঔপন্যাসিকের তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে হয়তো বা সহনাগরিকদের প্রতি লেখিকার দায়বদ্ধতাও মিশে আছে। ১৮৮১তে ইহুদিদের জন্য কলকাতায় স্কুল তৈরি হলেও ছাত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় সাড়ে ছ'হাজারে, তৈরি হয়েছিল সমিতি, ক্লাব; প্রকাশ পেয়েছিল 'সেমা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা।

মূলত মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে ইহুদি ডেভিড যোশুয়া পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, সেই সূত্রে মিতিন-টপুর-পার্থর সঙ্গে যোগাযোগ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে তৎকালীন ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) থেকে বহু ইহুদির সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন এলিস যোশুয়া হোটেলের চাকরি নিয়ে পরে নিজেই পার্কস্ট্রিটে খুলেছিলেন 'ঘ্যামচ্যাক রেস্তোরাঁ', এখন ঐতিহ্য নিয়ে যা চলমান — 'ট্রিঙ্কার্স'। গল্পের কেন্দ্রে থাকা ডেভিড যোশুয়ার দূর সম্পর্কের কাকা ছিলেন এলিস, যিনি সিরিয়া থেকে কিছুদিন বার্মায়

থাকলেও ডেভিডের বাবা সরাসরি কলকাতায় এসেছিলেন। ডেভিডের বক্তব্য — 'কলকাতায় প্রায় সব ইহুদিই তো বাগদাদি। অল্প কয়েক ঘর বেনে ইজরাইলিও ছিল। তবে এখন তারা প্রায় সকলেই ভারত থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। একমাত্র টিকে আছেন জ্যাকব পরিবার। তাঁরাও তো শুনলাম আমাদের পবিত্রভূমিতে চলে যাচ্ছেন।' এই পবিত্র ভূমি অর্থে 'ইজরায়েল'।

ডেভিডের মৃত ভগ্নিপতি আব্রাহামের সূত্রে ইহুদিদের কাজ-কারবার, চিনের সঙ্গে আফিমের ব্যবসা, নিজস্ব জাহাজের ব্যবহার, আফিম নিষিদ্ধ হবার পর কাপড়ের ব্যবসা এবং সেই 'বদখ্‌শনি চুনি'— 'যার জুড়ি নাকি দুনিয়ায় নেই।' এই জিনিসের উৎস সন্ধানে লেখিকা এনেছেন শ্যালোম কোহেনের প্রসঙ্গ, যিনি 'কলকাতার ইহুদিদের আদি পুরুষ'। সিরিয়ার আলেপ্পোয় জন্মানো 'নমস্য ব্যক্তি'র ইতিহাস — 'মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বাগদাদ-বসরা হয়ে ইংরেজদের জাহাজে চেপে মুম্বই এসে পৌঁছন। ওখান থেকে মেসোপটেমিয়ায়, এখন যাকে বলে ইরাক, ব্যবসা চালাতেন। মুম্বই থেকে যান সুরাট। তারপর লখনউ। অবশেষে কলকাতা এসে থিতু হন। ওই কলকাতায় বসে উনি হিরে, সিল্ক, নীল আর ঢাকাই মসলিনের বিশাল কারবার ফেঁদেছিলেন। লখনউতে বসবাসের সময় শ্যালোন ছিলেন সেখানকার নবাবের খাস মনিকার। হিরে-জহরত খুব ভালো চিনতেন কিনা। শোনা যায় লখনউ থেকে চলে আসার সময় প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন শ্যালোন।' তিন-কন্যা-সূত্রে তাঁর আত্মীয়তা ডুয়েক, সাদকা ও মাটুক পরিবারে, সেই সূত্র ধরে যোশুয়ার ঘরে গুপ্তধনের উপস্থিতি। এছাড়া রনজিৎ সিংহের দরবারে তাঁর খাতির ছিল 'হিরে-জহরতের সমঝদার হিসেবে'। এমনকি অন্যান্য ইহুদিদের মতো সুদের ব্যবসাও ছিল; শুধু মোটা-অঙ্কের লেনদেন নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই কারবার। এছাড়া তাঁর বড়োজামাই মোজেস ডুয়েক ভারতের অনেক রাজা মহারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইহুদিদের 'নেচার'টি উপন্যাস সূত্রে জানা যায় 'ওরা খরচের ব্যাপারে খুব টাইট। অবশ্য কারণও আছে। চিরকাল ওদের এমন তাড়া খেয়ে খেয়ে দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছে, বেহিসেবি হওয়ার ওদের জো ছিল না। উলটে যখন যেটুকু পেয়েছে, আঁকড়ে থেকেছে প্রাণপণে। আর সেই অভ্যেস থেকেই ওদের হাত থেকে অকারণে জলও গলতে চায় না।' আর ডেভিডের কথায় — 'আমরা ইহুদিরা বিনামূল্যে কোনও কাজ করি না, করাইও না।' সেই কারণেই তো শ্যালোন কোহেন নবাবের জমি দান হিসেবে গ্রহণ করেন নি, বিনিময়ে দিয়েছিলেন আংটি; সেখানেই তৈরি হয়েছিল ইহুদিদের নারকেলডাঙার কবরখানা।

গোয়েন্দা-কাহিনির শুরুর আগেই ঘটে গিয়েছিল দুটি মৃত্যু, পরে আরো একটি। মিটিং তার মগজাস্ত্র, প্রজ্ঞা দিয়ে উদ্ধার করেছে সবই। আর মৃত্যু এবং পারলৌকিক কাজকর্মের সূত্রে উঠে এসেছে আরো কিছু তথ্য। যেমন যোশুয়ারা ইহুদি-পুরোহিত বংশ, তেত্রিশশো বছর আগে সিনাই পর্বতের দৈববাণী, মৃত্যুশোকের চিহ্ন হিসেবে বুকের বাঁ-দিক ছেঁড়া কালো কোট পরিধান কিংবা উচ্চাসনে না বসা, শনিবারে স্যাবাথ বা কবর নিষিদ্ধ, শোক পালনের সময় ডিম খাওয়া, সমাধিতে হিব্রু ভাষায় কিছু লেখা, সাত দিন-ত্রিশ দিন-এক বছর ধাপে ধাপে 'অ্যাভেলিউট'। মূলত তারা জিহোভার ভক্ত, তাদের ক্যালেন্ডারও আলাদা; সেপ্টেম্বর মাসে হয় নিউইয়ার পার্টি, খ্রিস্টজন্মের ৩৭৬০ বছর আগে থেকে। ইহুদিদের ক্যালেন্ডারে 'মাসগুলোর নামও অন্যরকম। ইংরেজি বা ওয়ান প্যাটার্নের নয়। আরবি ধাঁচের।' পবিত্র হিব্রু ভাষায় রচিত তাদের ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ' ও ধর্মীয় অনুশাসন 'টোরা'। শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে, জাদুঘরের পিছনে মার্কুইস স্ট্রিট থেকে এজরা স্ট্রিট বা নারকেলডাঙায় ছড়িয়ে থাকা, কলকাতার প্রায় মুছে যাওয়া একটি সভ্যতাকে আখ্যানের পরতে পরতে মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন কথাকার সুচিত্রা।

'দুঃস্বপ্ন বারবার' (২০১৫) কলকাতার জৈন সমাজকে নিয়ে লেখা কাহিনি। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র-সরোবরের নিকটস্থ বহুতল থেকে শুরু করে বড়বাজারে জৈন ধর্মশালা হয়ে উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়ী, পরেশনাথ মন্দিরের কাছে বদ্রিদাস টেম্পেল স্ট্রিট পর্যন্ত স্থানিক বিস্তার। এসেছে রনকপুরের জৈন আশ্রমের প্রসঙ্গও। কলকাতার যে রাজস্থানী তথা মাড়োয়াড়ি জৈন পরিবারকে কেন্দ্র করে রহস্যকাহিনি নির্মাণ তাঁরা প্রাচীনপন্থী ও নিরামিষাসী। ঠাণ্ডা জলও পান করেন না, পাছে ঠাণ্ডায় জন্মানো ব্যাকটেরিয়া হত করার পাপ বইতে হয়। এমনকি কোনো কোনো গোঁড়া জৈন অ্যালোপাথি ওষুধ পর্যন্ত খান না। এঁরা কলকাতার বেশিরভাগ জৈনদের মতো শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের, দিগম্বর সম্প্রদায় শহরে কম। তবে মিতিনের তথ্য থেকে জানা যায় জৈন মানেই রাজস্থানী বা মাড়োয়ারি নয়। দক্ষিণ ভারতে এর ভালো প্রচার ছিল; একসময় বাংলার পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূমেও জৈনধর্মের 'রমরমা' ছিল, কিন্তু 'বৌদ্ধ আর হিন্দুরাজাদের চাপে পড়ে জৈন ধর্ম এ রাজ্য থেকে পিঠটান দিয়েছিল। আবার ফিরল মাত্র তিনশো বছর আগে রাজস্থানী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। আমরাও অমনি একদিন ধরে নিলাম ধর্মটা শুধু ওদেরই।... মহাবীর জৈনদের একজন প্রধান ধর্মগুরু। তিনি জন্মেছিলেন বিহারে,

রাজস্থানে নয়।' আহিরচাঁদ-আলোকচাঁদ-আকাশচাঁদ, যে শেঠ পরিবারের সদস্য, তারা জগৎ শেঠেরই। সাত-আট পুরুষ ধরে আছে বাংলায়। এরা রাজস্থানের ওসনগরের ওসওয়াল। চুরাশি ঘর মাড়োয়ারি বণিকের মধ্যে এরাই শ্রেষ্ঠ যদিও ওই পরিবার তাদের বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী জগৎ শেঠের প্রসঙ্গ এড়িয়েই যায়। এই কাহিনিতে তথ্য এভাবে দেওয়া হয়েছে, রাজস্থানের নাগৌর শহর থেকে পাটনায় আসা হীরানন্দ শাহর ছেলে মানিকচাঁদের মুর্শিদাবাদ আগমন ও মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগামী হওয়া। ঝানু ব্যবসায়ীর মতো ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে 'শেঠ' খেতাব আদায় করেছিলেন তিনি। দিল্লির আকালে হুন্ডিতে টাকা ধার দিয়ে মানিকচাঁদের দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ বাদশাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'জগৎ শেঠ' উপাধি; অতঃপর বংশের নাম 'জগৎ শেঠ'। দুপুরুষে বিপুল সম্পত্তি তৈরি হয়েছিল — 'ওঁদের মত টাকা তখন গোটা ভারতে একজন বণিকেরও ছিল না। ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ কোম্পানিগুলো তখন ধারের জন্য জগৎ শেঠের গদিতে এসে হাত কচলাত। মুর্শিদাবাদের কাছে মহিমাপুরে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে বাস করতেন জগৎ শেঠেরা, ধনদৌলত তখন ও বাড়িতে উপচে পড়তো।' আলোচ্য উপন্যাসে না থাকলেও শোনা যায় সে বাড়িতে বর্গির ব্যাপক লুণ্ঠনের পরেও কোষাগারে তার ছাপ পড়েনি। তবে মিতিনের জবানিতে শোনা গেছে, ফতেচাঁদের নাতি মহতাপচাঁদ পর্যন্ত জলুস ছিল, তারপর থেকে পতন, শুধু পতন।' পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের সঙ্গে শত্রুতা করলেও ইংরেজদের জয় লাভের পর মীরকাশিম মহাতাপ ও স্বরূপ দুই ভাইকে 'মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন'। তারপর মহতাপেপের ছেলে খুশলচাঁদ জগত শেঠ হলেও অপব্যয়ে কোমরের জোর ভেঙে গিয়েছিল, হাত পেতে নিয়েছিল ইংরেজদের মাসোহারা। তারপর ক্রম-অবক্ষয় ঘটেছে হারাকচাঁদ, ইন্দ্রচাঁদ, হয়ে গোবিন্দচাঁদে, মাসোহারার পরিমান হ্রাস পেয়েছে। আর 'নামকাওয়াস্তে' জগৎ শেঠ গোপালচাঁদের সময় মহিমাপুরের বারি-মন্দির ধূলিসাৎ (১৮৯৭)। তবে খোশলচাঁদের ভাই উদয়চাঁদ, উপাধি না নিলেও তাঁরা এই বংশের উত্তর পুরুষ। সেই সূত্র ধরে একুশ শতকে শেঠ-মাড়োয়ারিদের নিয়ে কাহিনি বয়ন করে ইতিহাসের অলিগলিতে আলো ফেলেছেন লেখিকা। তবে তাঁরা মূলত বেনিয়াজাত হলেও আকাশচাঁদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, উচ্চশিক্ষায়, চাকরি-জগতে তাঁরা পেছিয়ে নেই, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অ্যাডভোকেট, বিবিধ পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে কলকাতার বহু মাড়োয়াড়ি পরিবারের লোকজন।

'সারাঙায় শয়তান' (২০০৩) থেকে শুরু করে লেখিকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি (২০১৬) — মিতিন মাসির বিস্তার। পরিচালক অরিন্দম শীল হাতে মাত্র তিনটে দিন ও সারাঙায় শয়তান নিয়েও যথাক্রমে দুটি ছবি তৈরি করেছেন — 'মিতিন মাসি' (২০১৯) ও 'জঙ্গালে মিতিন মাসি' (২০২৪)। সম্প্রতি বড়োপর্দায় মুক্তি পেল মিতিন — 'একটি খুনির সন্ধানে'। এটি অবশ্য বড়োদের গল্প 'মেঘের পরে মেঘ' আশ্রয়ে তৈরি।

মূলত মধ্যবিত্ত নগর জীবনের কথাকার হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জনপ্রিয়তায় ছিলেন অগ্রগণ্য। লেখিকার প্রয়াণের পর অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছিলেন, "যখন জনপ্রিয়তা তুঙ্গে তখনই বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী লেখকের প্রয়াণ ঘটলো। ক্ষতি আমাদের সকলের। আরও বেশ কিছুকাল সৃষ্টিশীল থাকার বয়স ছিল তাঁর। আকস্মিক শারীরিক অসুস্থতার আঘাত না এলে তাঁর লেখার চিত্রমালায় একালের মধ্যবিত্ত সমাজের নিহিত সংকটের স্পন্দন আরো কিছুটা অনুভব করতে পারতাম আমরা।"[৩] মিতিন মাসির শেষতম-কাহিনি 'আনন্দমেলা' দপ্তরে পাঠানোর পর লেখিকার আকস্মিক মৃত্যু; তখনো তিনি 'সানন্দা' পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখছেন 'এই মোহমায়া'। শারদীয়া দেশের জন্য শুরু করেছিলেন উপন্যাস 'কাঁটা বেঁধা পায়ে'। মিতিন মাসির সত্যান্বেষণের সূত্রে হয়তো আরো কত ক্রম-বিলীয়মান নাগরিকের যাপিত-জীবন ও ঢাকা-পড়া-ইতিহাস পৌঁছে যেত পাঠকের দরবারে। মিতিন-মাসির ভক্তদের সেই অসম্পূর্ণ আশায় রেখে ঘটল কথাসাহিত্যের সম্পূর্ণা — সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অকাল প্রয়াণ।

তথ্যসূত্র:

১. 'মিতিন মাসি সমগ্র ১', সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভূমিকা অংশ
২. 'বর্ণময়', সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লালমাটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৩২৮
৩. 'একালের সমাজ — নারীর পথ-সন্ধান সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস', সুমিতা চক্রবর্তী, অরূপ আচার্য সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ সুচিত্রা ভট্টাচার্য', একান্তর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃ. ৯

—

© Santiniketan Sahityapath